رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ
تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ
ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ
اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ
الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ
اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ
رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

(৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (৪২) জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। (৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৩৬ আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

—অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ, ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্যে আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায় এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্যে সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আঃ)-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি এবং একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফেরও যেন আযাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু"—একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আঃ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেনঃ

وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ —অর্থাৎ, আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ্ তাআলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ, এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেননি যে, কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের হেদায়েত ও ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্যে পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ায় بواد غيرذى ماء (জলহীন প্রান্তরে) বলেননি; غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই

সেগুলো পাওয়া দুষ্কর।—(বাহরে-মুহীত)

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়াতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জেযা হিসেবে সরন্দ্বীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরাঈল বায়তুল্লাহর জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চারদিক প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ্ উঠিয়ে নেয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। হযরত জিবরাঈল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত এই প্রাচীর মূর্খতা যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ নির্মানকাজে আবু তালেবের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও নবুওয়তের পূর্বে অংশ গ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহ্র বিশেষণ محرم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়ার প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কায়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খা হবে। ইবরাহীম (আঃ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়েছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ — افئدة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে افئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تبعيض ও تقليل এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। অতফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; افئدة الناس বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আঃ) দোয়ায় বলেছেন ঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ - ثمرات শব্দটি ثمرة এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবতঃ খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثمرة শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার ثمرة বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثمرة বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরীর ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثمرة। কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شجر শব্দ ব্যবহার না করে شيء (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্যে শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবতঃ এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান, অথবা শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্যে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে ربنا শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ

رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ —এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আঃ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) দান করেছেন।

 ৭২৩

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ
فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ
وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن
قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا
بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

سورة الحجر مكية وهي تسع وتسعون آية وست ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾

(৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালেমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কূটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না (৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই—একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

সূরা হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লা-ম-রা ; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ —বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ, কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান ঃ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন ঃ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ অর্থাৎ,হে আমার পালনকর্তা। আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে।

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে কাফেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে ঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا —অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্‌কে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে,তিনি আল্লাহ্ তাআলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ —অর্থাৎ, সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ —অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ, অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্যে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে

বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

এতে বাহ্যতঃ আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে وَأَنذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তাআলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্যে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এর পরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ

مِنْهُ الْجِبَالُ অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশে সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের إن শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ অর্থাৎ, কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তাআলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছেঃ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا অর্থাৎ, গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণতঃ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রঙ হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ্র বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে-আহমদে ও তফসীর ইবনে জরীরে উল্লেখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদমসন্তান এই পৃথিবীতে জামায়েত হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ
مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَ
قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَّوْ
مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ
الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن
قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا
عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

(২) কোন সময় কাফেররা আকাঙ্খা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত। (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না। (৬) তারা বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। (৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না—বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। (১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্যে মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই ঃ এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল ঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

সূরা হিজর

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا —থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহ্র কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।—(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া।—(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্যে অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্খা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে দামেশকবাসীগণ। তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্খী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা ঃ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিকদিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন ঃ তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল ঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল ঃ হাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রীষ্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থ বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম বলেন ঃ ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন ঃ কোরআন পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে ঃ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ—অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আবু সালেহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ এখানে بروج এর তফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'অকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিককালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগাত্র এবং আকাশের অনেক নীচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল—এই উভয় অর্থে سماء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سماء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত, এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا এর তফসীরে করা হয়।

উলকাপিণ্ড ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের

পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জ্বিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জ্বিনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۭ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ

شِهَابًا رَّصَدًا

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্দ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্বেও জ্বিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সাংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। সূরা জ্বিনের وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তফসীরে ইন্‌শাআল্লাহ্–এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে শয়তাদেরকে মারার জন্যে উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তারা বলেন ঃ সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়—উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি–চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহ্‌রীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জ্বিনের উল্লেখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন ঃ উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন ঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন ? এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্যে নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ
لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا
نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَ
إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَـْٔخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَآنَّ
خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾
فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبٰىٓ أَنْ يَّكُونَ مَعَ
السّٰجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ
لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

(১৯) আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। (২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস—সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? (৩৩) বলল ঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ এর এক অর্থ অনুবাদে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম নাহলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ্ তাআলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্যে একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ —এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তাআলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ থেকে وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ পর্যন্ত খোদায়ী কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্যে প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্যে বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছে। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়ো জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও আন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্ তাআলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার

হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহ্র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভান্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا —এখানে فرات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি যদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্যে মিঠা করে দিয়েছি।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ – এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مستقدمين (অগ্রগামী দল) ও مستاخرين (পশ্চাদগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেন ঃ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক বলেন ঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। হাসান কাতাদাহ্ বলেন ঃ এবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী গোনাহ্গাররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সেজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবতঃ প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহ্র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে যেতে পারে।

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ—এ সম্পর্কে পন্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রউফ মানাভী বলেন ঃ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نفخ শব্দের অর্থ ফুঁক দেয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেয়া হয়, তবে ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।—(বয়ানুল -কোরআন)

কাযী সানাউল্লা পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন ঃ রূহ দুই প্রকার—স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ্ তাআলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নীচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই ঃ কল্‌ব, রূহ, সির, খফী, আখ্‌ফা—এগুলো আদেশ- জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিন্ড জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রামিত হওয়াকেই نفخ روح তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

(৩৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। (৩৫) এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্ বললেন ঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই ; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে। (৪৫) নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে ঃ এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল ঃ সালাম। তিনি বললেন ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারেভীত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِن رُّوحِي বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্র আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্র নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যেই কোরআন মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফ্স বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ المرء مع من احب অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গলাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গলাভের কারণেই খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবূলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা ঃ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ — ইমাম আহ্মদ, ইবনে জরীর তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ

قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلم عليم ﴿٥٣﴾ قال أبشرتموني
على أن مسني الكبر فبم تبشرون ﴿٥٤﴾ قالوا بشرنك
بالحق فلا تكن من القنطين ﴿٥٥﴾ قال ومن يقنط من
رحمة ربه إلا الضالون ﴿٥٦﴾ قال فما خطبكم أيها
المرسلون ﴿٥٧﴾ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ﴿٥٨﴾ إلا آل
لوط إنا لمنجوهم أجمعين ﴿٥٩﴾ إلا امرأته قدرنا إنها لمن
الغبرين ﴿٦٠﴾ فلما جاء آل لوط المرسلون ﴿٦١﴾ قال إنكم قوم
منكرون ﴿٦٢﴾ قالوا بل جئنك بما كانوا فيه يمترون ﴿٦٣﴾ و
أتينك بالحق وإنا لصدقون ﴿٦٤﴾ فأسر بأهلك بقطع من
اليل واتبع أدبرهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا
حيث تؤمرون ﴿٦٥﴾ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء
مقطوع مصبحين ﴿٦٦﴾ وجاء أهل المدينة يستبشرون ﴿٦٧﴾
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ﴿٦٨﴾ واتقوا الله ولا
تخزون ﴿٦٩﴾ قالوا أولم ننهك عن العلمين ﴿٧٠﴾ قال هؤلاء بناتي
إن كنتم فعلين ﴿٧١﴾ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴿٧٢﴾

(৫৩) তারা বলল ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? (৫৫) তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন ঃ অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভুক্ত হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌঁছল। (৬২) তিনি বললেন ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে। (৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌঁছল। (৬৮) লূত বললেন ঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না। (৭০) তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (৭১) তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।

এগুলাকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে।—(কুরতুবী)

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين — এ আয়াত থেকে জান্নাতের দু'টি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। (এক) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই ; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে ঃ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد —অর্থাৎ, এ হচ্ছে আমাদের রিযিক, যা কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে وما هم منها بمخرجين —অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তুবও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়। কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে ঃ لا يبغون عنها حولا অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لعمرك —রূহুল মা'আনীতে অধিকসংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لعمرك - এর মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নুবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবুনয়ীম ও ইবনে মারদুবিয়াহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা কোন পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ
أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا
مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾
وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا
النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন আছে। (৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুন : আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ এতেআল্লাহ্‌তাআলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا —অর্থাৎ, এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্যে গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্যে শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে।

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ
أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ
يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
مِّنَ السّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

سورة النحل مكية وهي مائة وثمان وعشرون اية وستة عشر ركوعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلٰى مَنْ يَشَآءُ
مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

(৯১) যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে। (৯৭) আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

সূরা নাহ্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে ; যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ —এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম গোপনে গোপনে এবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন-দু'জনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা, খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, এবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ —বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি ঃ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিব্রাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার ঃ وَلَقَدْ نَعْلَمُ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ ও এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

সূরা নাহ্ল

এ সূরা নাহ্লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ ত'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা রসূল (সাঃ)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে; অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতি সত্বর দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।—(বাহরে-মুহীত)

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহ্র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ্ তাআলা এ থেকে পবিত্র। —(বাহরে-মুহীত)

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই মানুষ একথা বোঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে روح শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদগণের মতে হেদায়েত বোঝান হয়েছে।—(বাহ্র) এ আয়াতে তওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলার বিভিন্ন নেয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ — অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাক্‌শক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ —অর্থাৎ, এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

(দুই) وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ —অর্থাৎ, মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খোরাকও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্যে বলা হয়েছে ঃ وَمَنَافِعُ —অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের দুর-দুরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنبِتُ لَكُم بِهِ
الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

(৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। (৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্র কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَنْعَام —অর্থাৎ, উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা, বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে ঃ

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً — অর্থাৎ, আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও—বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্যে বর্তমান থাকে।

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ ঃ সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না ; যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি ; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে সংযোজিত করে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোল্লেখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خلق বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে يخلق বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাক প্রথমে انعام অর্থাৎ, উট, গরু ছাগল

ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছেঃ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার গোশতকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন।—(আহ্‌কামুল-কোরআন-জাসসাস)

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নেয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা—এটা হারাম।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ — شجر শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شجر বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক تُسِيْمُوْنَ শব্দটি اسامة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্যে ছেড়ে দেয়া।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ — এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদে যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নীচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণতি হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ, এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝাতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তা কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ, এতে তাদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্যে স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا — এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا — এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حلية এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فلك শব্দের অর্থ নৌকা। مواخر শব্দটি ماخرة এর বহুবচন। مخر

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن
يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ
مَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى
اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

(১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৭) যিনি সৃষ্টি করেন,তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। (২১) তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না। (২২) আমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ্। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (২৫) ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিলনা।

এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ - رواسى শব্দটি راسية এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تميد শব্দটি ميد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক—উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন—যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্যে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্যে আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে-মকসুদে পৌঁছার জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে ঃ وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্যে পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ অর্থাৎ, পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্যকিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ بَلٰٓى اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ
اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ
هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا
مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ
يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

(২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন ঃ আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলবে ঃ নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফেরদের জন্যে, (২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হ্যাঁ নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট! (৩০) পরহেযগারদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে। এর পাদদেশে দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্যে তাতে তা-ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ্র পরহেযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফেররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে,তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেননি, কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই উল্টে তাদের উপর পড়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কেয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ
مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ
كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ
وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَ
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ
لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا
ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

(৩৫) মুশরিকরা বলল ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাগূত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি ; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়। (৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক ; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপমহাদেশেও আল্লাহ্‌র কোন রসূল আগমন করেছেন কি?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا এবং আরও একটি আয়াত وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ থেকে বাহ্যতঃ একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপরপক্ষে لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যতঃ আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর নবুওয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর পর কোন পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যেই কোরআন পাকে তাদেরকে الْأُمِّيِّينَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেননি।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا — এটি هجرة থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্যে দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় এবাদত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الهجرة تهدم ما كان قبلها অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?

আলোচ্য আয়াত কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং দ্বিতীয়তঃ পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। "দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা" এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্যে গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্‌যত ও গৌরব পাওয়া—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযুল মূলতঃ ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তী কালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্যে, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা মদীনাকে তাঁদের জন্যে কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ্ তাআলা অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ

والذين هاجروا عام فى المهاجرين كائنا ما كانوا فيشمل اولهم واخرهم অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যেকোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরণের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্যে সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِي اللّٰهِ অর্থাৎ, হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে ঃ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে ঃ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর রাখা; অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে ঃ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান ঃ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

কুরতুবী ইবনে-আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন ঃ দেশ ত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্যে হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার ঃ

(প্রথম) দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলেও ফরয ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে।

দ্বিতীয়, বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে-কাসেম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে-আরাবী লিখেন ঃ এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্যে জরুরী; যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয়, যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

চতুর্থ, দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয; বরং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত। যেস্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন ঃ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ তারপর হযরত মূসা (আঃ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে ঃ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ

পঞ্চম, দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

ষষ্ঠ, ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ, কোন বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(১) শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে বিশ্ব-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছেঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলেমের মতে এ ধরণের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশে ছিল।

(২) হজ্বের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।

(৩) জেহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ আয়াতে ابتغاء

فضل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হজ্বের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্যে সফর করা আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর। ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশীর জন্যে ফরযে কেফায়া।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় ঃ মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে-আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয।

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যে সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর করে, তার জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে নয়; বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۴۳ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۴۴
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۴۵ أَوْ يَأْخُذَهُمْ
فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۴۶ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۴۷ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِن شَيْءٍ
يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ
دٰخِرُونَ ۴۸ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن
دَآبَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۴۹ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۵۰ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۵۱ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ ۵۲ وَمَا بِكُم
مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ۵۳
ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۵۴

(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু। (৪৮) তারা কি আল্লাহ্‌র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না—উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবাদত করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা ঃ আলোচ্য আয়াতের فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবিগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে,যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে,তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ্‌মাসআলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন ; কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ্ ভীতি ও পরহেযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফে'য়ী মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্লাইস (রহঃ) প্রমুখ। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নবুওয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা

দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফেকাহবিদগণ, ইমাম গাযযালী, রাযী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা (রহঃ) এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লেখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্ ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাসআলায় যে কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফেকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দ্বীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কেরআতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কেরআতেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবিগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরআতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) সেই এক কেরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরআত সঠিক ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হেফাযতের কারণে একটি মাত্র কেরআত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্যে নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণতঃ রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে মনোনীত করে,তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দ্বীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোন কোন আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তাআলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফেকাহ্‌র কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন

যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বলেছে ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এই মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كان خلقه القرآن এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্ তাআলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমআ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থশিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে,তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি ; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন ঃ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। نعوذ بالله

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও ; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ এতে প্রথমে رب শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لام সহকারে আল্লাহ্র দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ
تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ
أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ
أَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

(৫৫) যাতে ঐ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও—সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্যে একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে—তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। (৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(৬১) যদি আল্লাহ্ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্‌র জন্যে সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ্ তাআলার কন্যা।

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সন্তান শাস্তি ও বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা খোদায়ী রহস্যের মোকাবেলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।—(রুহুল-বয়ান)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ
مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾
وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا
حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى
النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾
ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ
بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ
فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ
اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। (৬৬) তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর ফল থেকে তোমরা মধ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৭১) আল্লাহ্ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নেয়ামত অস্বীকার করে? (৭২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যায় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী তাই বলেছেন।—(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে — اللّهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন।

তিনি আরও বলেছেন ঃ দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে— اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশী দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।—(কুরতুবী)

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সেসব নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লেখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্যে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যেই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো—মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপরকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি

প্রস্তুত করবে—মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নেয়ামত; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নেয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্‌টি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سكر এর বিপরীত رزق حسن আনার কারণে জানা গেছে যে, سكر ভাল রিযিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে سكر এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে।—(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্‌সাস)

(কোন কোন আলেমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্যে কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।—(জাস্‌সাস, কুরতুবী- সংক্ষেপিত)

o اوحى এখানে وحى শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النَّحْلِ —জ্ঞান, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ বলেছেন, কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্যে সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।—(আলজাওয়াহের)

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছেঃ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্‌র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ — মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্যে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যেও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালসা তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol) – এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন ঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন ঃ صدق الله وكذب بطن اخيك

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি نكرة تحت الاثبات — এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বোঝা যায় না। কিন্তু شفاء শব্দের تنوين যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের। কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ —(কুরতুবী)

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিবিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উম্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।—(আবু দাউদ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের আভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

(৪) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা একে নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন ঃ আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ সেটি কোন্ রোগ? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য।—(আবু দাউদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েতে হযরত খুযায়মা (রাঃ) বলেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরণের আত্মরক্ষা ও হেফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তকদীরকে পালটে দিতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। – (কুরতুবী)

কোন কোন সূফী, বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবিগণের মধ্যেও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত ওসমান বললেন ঃ তাহলে কি চান? উত্তর হল ঃ আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান বললেন ঃ আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন ঃ চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে।)

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরূহ মনে করতেন। সম্ভবতঃ এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেননি। এটা প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌প্রেমে মত্ত থাকার ফলে বন্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরূহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ ; বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ — এখানে مَّن يُرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমানুয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের

দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من سوء العمر وفى رواية من ان ارد الى....

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সেসব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ —এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ — নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকার মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহ্র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান ঃ তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলে ঃ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ – অর্থাৎ, আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্যে তৈরী করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ – আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার।

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا – আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً – অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশী। পিতা থেকে শুধু একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যেই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত حفدة শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য।—(কুরতুবী)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا
لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ
اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ
يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ
اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ
كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ ۙ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾
وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا
كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾
وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا ۙ وَّ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۗ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللّٰهُ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

(৭৩) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুযী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব, আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্র, কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির, একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের উপর বোঝা। যেদিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে? (৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ —বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহ্কে আল্লাহ্র দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহ্দের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ্ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্র কাজে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাআলার জন্যে সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا – এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্যে পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝত ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্যে মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোন্ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেয়া! এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا এর পরে বলা হয়েছে : وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٔدَةَ —অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سمع অর্থাৎ, শ্রবণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ
الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا
اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
الْمُبِيْنُ ۝ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ
الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا
يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَ
اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ
شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَاَلْقَوْا
اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ
يَوْمَئِذِ ۨالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(৮০) আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্মগোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া মাত্র। (৮৩) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শেরেকীর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে।

করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজটি মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে افئدة বলা হয়েছে। এটা فؤاد এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন ; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই ; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গতঃ হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবতঃ তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا — এখানে بيوت শব্দটি بيت -এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بيت বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ 'যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে, তা যমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بيت তথা গৃহে পরিণত হয়।'

مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ এবং وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হল যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ — এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআনে পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَ
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا
مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن
تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

(৮৮) যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। (৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন — যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (৯১) আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ্ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। (৯৩) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হ'ল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে বলেন : কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ — এতে কোরআনকে যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। 'যাবতীয় বিষয়' বলে প্রধানতঃ দ্বীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুওয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গতঃ এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দ্বীনী খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কোরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ — বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : এটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। — (ইবনে-কাসীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রাঃ) নামক একজন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাসীর হাফেযে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মা'রেফাতুচ্ছাহাবা থেকে সনদ-সহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল : আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন : তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল : আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই : من انت وما انت আপনি কে এবং কি?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ — উভয় দূত অনুরোধ করল

এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল ঃ এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।—(ইবনে-কাসীর)।

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মযউন (রাঃ) বলেন ঃ শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মযউন বলেন ঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে ঃ

والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اصله لمورق واعلاه لمثمر وما هو بقول بشر -

আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন ঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখা নিম্নরূপ ঃ

عدل — শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عدل বলা হয়। اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ, عدل এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عدل শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরবী বলেন ঃ 'আদল' শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আদ্‌ল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদ্‌ল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশী বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদ্‌ল হচ্ছে নি[illegible]বং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্যে নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবু আবদুল্লাহ্ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা—সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।—(বাহ্‌রেমুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

اَلْإِحْسَان — এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। এক— কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই— কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্যে আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে فى। অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার এহ্‌সান অর্থাৎ, কোন কাজকে সুন্দর করা— এটাও ব্যাপক ; অর্থাৎ, এবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরাঈলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এবাদতের এহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র এবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক এবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না — এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্‌সান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে এবাদতের এহ্‌সান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের এহ্‌সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও

জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত এবাদতই করুক, এহ্সানকারী বলে গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে এহ্সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেয়া — কমও নয়, বেশীও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এহ্সান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং এহ্সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে।

وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ — এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। ايتاء শব্দের অর্থ কোন কিছু দেয়া এবং قربى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذى القربى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ -এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ — অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। এহ্সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। তাই মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্ই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بغى - শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء ও بغى ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে بغى -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌছে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ঃ যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরী করে নেয়া হয়; অর্থাৎ, দায়িত্ব নেয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عهد শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহ্সানের আদেশ দেয়া হয়েছিল। عدل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় গোনাহ্। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ্। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফ্ফারা জরুরী হবে।— (কুরতুবী)

أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ — এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভংগ করো না। উদাহরণতঃ তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপরদল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা রৈপিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে অংগীকার ভংগ করে, না আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে রিপুর প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ
ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ
لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ
اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ
يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَاِذَا
قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾
اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾

(৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত। (৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (৯৮) অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। (৯৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে। (১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে ঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا — এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ্। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। উদাহরণতঃ সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্যে কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

উৎকোচের সংজ্ঞা ঃ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতের ভাষায় তা এই ঃ

অর্থাৎ,—যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে।—(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ ৫ম খন্ড)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ —অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণতঃ ধন-সম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন ঃ ৮

শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'হায়াতে তাইয়্যেবা' কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক জীবন। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্যে সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলে অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্দ্বারা শয়তান পলায়ন করে।

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত।—(বয়ানুল-কোরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরও জরুরী হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যেও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ মানুষের শত্রু দু'রকম। এক, স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে ; যেমন সাধারণ কাফের। দুই, জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্যে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ, প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জেহাদ ও লড়াই ফরয করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্যে এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক—জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়—সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ্ শুধু প্রথম রাকআতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে-মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে—উভয় অবস্থাতে তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোন সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া উচিত।

কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত।—(দুররে-মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।—(ইবনে-কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।—(শামী)

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ
نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

(১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে ঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৬) যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ্ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

মুক্তির পথ ঃ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফুরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফুরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফুরী অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফুরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু'উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফুরির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যখন কুফুরী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয করলেন ঃ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্যে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা ঃ اكراه -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও

অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اكراه غير ملجئ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফুরী বাক্য বলা অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্‌ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اكراه ملجئ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফুরী কলেমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ্‌ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেয়া হয় তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে।—(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক, যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ; যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ —অর্থাৎ, অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, لايحل مال امرئ مسلم الابطيب نفس منه "কোন মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশীতে তা দিতে সম্মত না হয়।"

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে—জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশী ইত্যাদি শর্ত নয় ; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - رواه ابوداود والترمذى অর্থাৎ, দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা ১/২ তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

ইমাম আযম আবু হানীফা, শা'বী, যুহ্‌রী, নখয়ী ও কাতাদাহ্‌ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেয়ার সাথে— মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয় ; যেমন, পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা, হাদীসে আছে, رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه -অর্থাৎ, আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্যে কোন গোনাহ্‌ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণতঃ একজন অন্য জনকে ভুলবশতঃ হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্‌ এর পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিয়ের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً
يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ
اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوْا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا
حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ
هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী। (১১৪) অতএব, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১১২তম আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্যে 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করল যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংসে হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

উল্লেখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : ১১৫ তম আয়াতে ব্যবহৃত انما শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তাদের হারাম কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খন্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

(১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্রই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যেই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (১২৫) আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে গোনাহ্ বোঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্ না বোঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে ঃ আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ এর جهل শব্দ নয় বরং جهالة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جهل শব্দটি علم এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে جهالة এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কান্ড, যদিও তা বোঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বোঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্ই মাফ হয় না ; বরং যে গোনাহ্ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

১২০ তম আয়াতে امة (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। قانت শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উভয়গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে, আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের আগুন, পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্খার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া- এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উল্লেখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দ্বীনে ইবরাহিমীর অনুসরণের নির্দেশ ঃ আল্লাহ্ তাআলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সাঃ)-এর শরীয়তেও কতিপয় বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক, সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছ। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই, আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثم (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম ঃ আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর কুরতুবীতে

রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়্যানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল ঃ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ "মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমদেরকে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ বিশেষতঃ সুরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।" উল্লেখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دعوة – এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সুরা আহ্যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا এবং সুরা আহ্কাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সুরা আলে-এমরানে আছে,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় دعوت الى الله কোন সময় دعوت الى سبيل الله এবং কোন কোন সময় دعوت الى الخير শিরোনাম দেয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তাঁর দ্বীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ -এতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ رب (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল-মা'আনী বাহ্‌রেমুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع -অর্থাৎ, এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল-বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ 'হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।'

وَالْمَوْعِظَةِ - وعظ ও موعظة -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। —(কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব)

الْحَسَنَةِ -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই—শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

موعظة শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। —(রূহুল-মা'আনী)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে حسنة শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - جادل শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। مجادلة এখানে বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দুরিভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ —অন্য আয়াতে হযরত মুসা ও হারূন (আঃ)-কে فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) হিকমত। (দুই) সদুপদেশ এবং (তিন) উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্যে, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্যে এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্যে যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমূল-উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে হওয়া আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যেই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যদ্দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্খাবশতঃ বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি-হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক, মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীত দু'টি — হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -এর শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ বাক্যে প্রথমত ঃ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারী দেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে ; বেশী হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদত বরণ এবং হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনে ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দার-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)-এর মৃতদেহও ছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম., আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে।—(তাফসীর কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।—(তিরমিযি, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেন।—(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাযিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফেকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

سورة بني اسرائيل مكية وهي مائة واحدى عشرة آية واثنا عشر ركوعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ
اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١) وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ
جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا (٢)
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (٣)
وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤) فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا (٦)
اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۣ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ
فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا (٧)

সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১১

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৪) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।—(জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন-এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ –আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয়ঃ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে ঃ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না- সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ –এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহ্‌সান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

সূরা বনী-ইসরাঈল

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَسْرٰى শব্দটি اسراء ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায়

সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে'রাজ সূরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে عَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মে'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عبد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মে'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয় وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে رؤيا (স্বপ্ন) বলে رؤيت (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رؤيا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মে'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মে'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো এই : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ্, আবু আইউব আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)।

এরপর ইবনে-কাসীর বলেন فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের

সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে ঃ হাফেয আবু নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহ্ইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বোখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা জানার জন্যে আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মে'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বোঝে নেবেন। আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল ঃ নবুওয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পন্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল ঃ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খন্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচিছল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তবা আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মে'রাজের তারিখ ঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নবুওয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন ঃ মে'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন ঃ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন ঃ নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭ তম রাত্রি মে'রাজের রাত্রি।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন ঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।—(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর

সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছেন।—(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃঃ, ৪র্থ খন্ড)

বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত ঃ আয়াতে بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ বলা হয়েছে। এখানে حول বলে সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ ঃ ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব।—(কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (১) মদীনার মসজিদ, (২) মক্কার মসজিদ, (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা ঃ বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটি হয়। বায়তুল-মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলেন মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা ঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেকদিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লেখিত দু'টি ঘটনা কোন্‌গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্ তাআলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আঃ) জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা ন'ছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বোখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তাআলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লেখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আঃ)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾
وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾
وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ
طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾
اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ
اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ
بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

(৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি। (৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয় (১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। (১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই। (১৭) নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন : وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا —অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মূসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিতেই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ : বনী-ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এবাদতের জন্যে দু'টি স্থানকে এবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের খ্রীষ্টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশে অভিযান করলে আল্লাহ্ তাআলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহ্র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় : উল্লেখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীরা যখন কেখনো

ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عبادنا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্যে পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عبده(দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেয়ার জন্যে যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে عبادنا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اضافت তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহ্‌র বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اضافت তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে হতে পারে।

'আকওয়াম' পথ ঃ কোরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।— (কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে ; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন্ কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্যে এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তাআলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ

السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। (দুই) দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ ঃ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে ঃ পরওয়ারদেগার ! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে ঃ আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে।— (মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন ফেকাহ্‌বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্‌র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও নবী অথবা তাদের

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ
وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ
رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম। (২২) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।

কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ وَإِذَا أَرَدْنَا এবং أَمَرْنَا অতঃপর বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমায়ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প – আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ঃ আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ... যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশেই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় أَرَادَ الْآخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেদআত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক-- গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيَهَا শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়—সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রূহুল মা'আনী سَعْيَهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না— এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল : আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন : (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল : এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফযীলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল : সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল,তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বলেনঃ যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্বের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল : সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন : হাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় : (৬) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে আবু বকরা (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় : ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বোখারী থেকে হযরত আসমার (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন : صلى أمك অর্থাৎ, "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলে : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে

আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।

মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জেহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল ঃ জ্বী হাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জেহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জেহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল ঃ আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাম্ (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তাঁদের হাসাও; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল ঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদে যাব না।— (কুরতুবী)

মাসআলা ঃ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে-আইন না হলে এবং ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দ্বীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্যে সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার এন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজার (রাঃ) হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত ঃ বার্ধক্যে ঃ পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজেব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্যে অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

(এক) তাঁদেরকে 'উহ্'-ও বলবে না। এখানে 'উহ্' শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ্' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন ঃ যেমন কোন গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحٌ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্যে নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পটভূমি। কেননা, এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ

মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লেখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্যে জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اوابين শব্দের অর্থ توابين অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকআত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে صلوٰة الاوابين বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা اوابين অর্থাৎ, توابين (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেনঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ— এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মত ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। – (তফসীর-মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تبذير অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تبذير এবং অপরটি اسراف আলোচ্য আয়াতে تبذير নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াতে اسراف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহ্র কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে اسراف ও تبذير বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ্র কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اسراف বলা হয়। তাই تبذير اسراف এর চাইতে গুরুতর। تبذير কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ'ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয়। একে اسراف ও বলে। এটা হারাম।— (কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تبذير এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়— এটাও تبذير এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تبذير এর অন্তর্ভুক্ত নয়।—(কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু

লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযুলে ইবনে মারদওয়াইয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভিতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্র পথে বেশী ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর ঃ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্যে অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন পাকের مَّحْسُورًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্যে এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকল্যের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেননি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্যে, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ ঃ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃংখলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَّحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, ملوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَّحْسُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে مَّحْسُورًا অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।